ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ ▶

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স : মহাবিপর্যয়ের হাতছানি

ওষুধ কম্পানির মালিকরা কি জানেন, কোনো না কোনো সময় তাঁরাও রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার শিকার হতে পারেন। শিকার হতে পারেন তাঁদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কথা বাদই দিলাম। ওষুধ কম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা আছেন, তাঁরা যদি রেজিস্ট্যান্ট সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিতে চান, তাহলে কোন চিকিৎসক কোন অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে তাঁদের রক্ষায় এগিয়ে আসবেন, তা কি তাঁরা বলতে পারবেন? উত্তর নিয়ে ভাবার অবকাশ রয়েছে। রেজিস্ট্যান্ট সংক্রামক ব্যাধি যদি সারা বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে মানবসভ্যতা এক মহাবিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে

১৭ নভেম্বর অনলাইনে প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত ল্যানসেট জার্নালে 'অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স–নিড ফর গ্লোবাল সলিউশন' শীর্ষক একটি বিশ্লেষণধর্মী দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। বিশ্বের ২৬ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও ওষুধ বিশেষজ্ঞ প্রবন্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, 'অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স' যে হারে বাড়ছে, তাতে করে হয়তো দুই থেকে তিন দশকের মধ্যে মানুষ সংক্রামক রোগে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করবে। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণজনিত মৃত্যুহার বিংশ শতাব্দীর পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, যখন কোনো কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না। কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিকের অভাবে অতি সাধারণ সার্জারি বা অস্ত্রোপচার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে বিবিসি বাংলা লন্ডন থেকে আমার একটি টেলিফোন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে, যা বিবিসি বাংলা প্রভাতি অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ও তার ভয়াবহ পরিস্থিতির ওপর আমি অতীতে পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছি এবং টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার প্রদান করেছি। বিবিসি বাংলায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকারটি বিস্তৃত আকারে পাঠকদের উদ্দেশে এখানে উপস্থাপন করছি।

১৯২৮ সালে জীবাণুবিদ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করার পর চিকিৎসাবিজ্ঞানে বলতে গেলে এক অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেল। অলৌকিকভাবে আবিষ্কৃত এই অ্যান্টিবায়োটিক বাজারে আসার পর অপ্রতিরোধ্য সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মানব সভ্যতা এক অনন্য হাতিয়ার হাতে পেয়ে গেল। পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত সংক্রামক রোগ প্রতিকারে বাজারে তেমন কোনো কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিকই ছিল না। কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিকের অভাবে তখন বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ মানুষ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করত। পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হওয়ার পরবর্তী ২৫ বছরে বিশ্বব্যাপী সালফাড্রাগ, ক্লোরামফেনিকল, টেট্রাসাইক্লিন ও অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড-জাতীয় অনেক কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক বাজারজাত হয়ে গেল। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যখন নতুন নতুন কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবনে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন ভোক্তা ও চিকিৎসকদের অযৌক্তিক ও অবিবেচনাপ্রসূত আচরণের কারণে মানবসভ্যতা এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়ল। যে অ্যান্টিবায়োটিককে মনে করা হতো রোগ চিকিৎসার ম্যাজিক বুলেট, যা যেকোনো জীবাণুর বিরুদ্ধে অব্যর্থ–এসব অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার এমন এক মাত্রায় পৌঁছে গেল যে কিছু কিছু জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতার প্রতি উল্টো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল। আমরা জীবাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিকের নৈর্বাচনিক কার্যকারিতাকে খাটো করে দেখেছিলাম। কয়েক দশকের মধ্যে প্রতীয়মান হয়ে গেল অ্যান্টিবায়োটিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ও অপব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক বিবর্তনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন করে ফেলল। বিজ্ঞানের ভাষায়, আমরা এসব জীবাণুকে বলে থাকি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া। এসব রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী শুরু হয়ে গেল এক অপ্রতিরোধ্য বিপর্যয়।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রাণঘাতী অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগের সংখ্যা ও এসব রোগ চিকিৎসায় কার্যকর ওষুধের মধ্যে এক গভীর ফাটল বা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে। এই দূরত্ব অদূর ভবিষ্যতে দূর হবে বলে প্রতীয়মান হয় না এ কারণে যে রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুঘটিত সংক্রামক রোগ চিকিৎসায় পর্যাপ্ত নতুন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবন হচ্ছে না বা সমান তালে ভবিষ্যতেও হবে বলে আশা করা যায় না। প্রিয় পাঠক, এবার শুনুন কিভাবে ম্যাজিক বুলেট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত অলৌকিক অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াল। জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিন বিভাগের ক্লিনিক্যাল ডাইরেক্টর ড. পাউল আউওয়েটার প্রতিদিন এই সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন। সংকটের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, রোগীরা দিন দিন আরো বেশি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এ কারণে আমাদের ব্যাপকভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হচ্ছে। ফলে জীবাণু নিজেদের অবয়ব বা কাঠামো পরিবর্তন করে ফেলছে। অন্যদিকে আমরা এসব জীবাণু মোকাবিলায় নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবন বা আবিষ্কারে উৎসাহ ও উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ নিয়ে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া বা দুশ্চিন্তা নেই। কেননা, তারা মনে করে, অতীতের মতো চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা পর্যাপ্ত কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করে সংকট মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ওষুধ কম্পানিগুলোই তাদের স্বার্থে এ ধরনের আবিষ্কারে এগিয়ে আসবে, যেমন অন্যান্য রোগের বেলায় অতীতে এসেছে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন। অ্যান্টিবায়োটিক-সম্পর্কিত সংকট নিয়ে মানুষ যখন পুরোপুরি অবহিত হবে, তখন সম্ভবত অনেক দেরি হয়ে যাবে। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট সংক্রামক রোগ মানব সভ্যতার জন্য এক ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে যাচ্ছে। এই বিপর্যয়ের মাত্রা অনিশ্চিত, ভেদাভেদ অনির্ধারিত, ধনী-গরিব, শিশু-বয়স্ক, সুস্থ-প্রতিরোধ ক্ষমতাবিহীন রোগী কেউই এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে না। তখন একের দোষ অন্যের ওপর চাপানো ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। এই সংকট সৃষ্টি অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার বা অপব্যবহারের ফলে রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার জন্য দায়ী কে? প্রথমে বলব, দায়ী চিকিৎসক।

বিশ্বব্যাপী বহু চিকিৎসক অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা, অনিশ্চয়তা, অবহেলার কারণে রোগ নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়ে অযৌক্তিক ও ঢালাওভাবে রোগীকে ওষুধ প্রয়োগ করে থাকেন। তাঁদের এই আচরণের মূল কারণ দুটি। প্রথমত, রোগী নিজেরাই এ ধরনের চিকিৎসা চায় এবং প্রেসক্রিপশনে বেশি ওষুধের উপস্থিতি তাদের মনস্তাত্ত্বিক আস্থা বাড়ায়। চিকিৎসকরা ব্যবসায়িক কারণে রোগীর এই মানসিকতাকে আস্থায় নেন। দ্বিতীয়ত, খুব কম চিকিৎসকই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেন।

সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য তাঁরা একই প্রেসক্রিপশনে একাধিক নামের অ্যান্টিবায়োটিক প্রদান করে থাকেন এই ধারণা নিয়ে যে কোনো না কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর হবেই এবং রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে। এ ধারণা ঠিক নয়। প্রদত্ত একাধিক অ্যান্টিবায়োটিকের কোনোটাই জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর নাও হতে পারে। উল্টো জীবাণু এসব অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি অতি সহজেই রেজিস্ট্যান্ট হয়ে উঠতে পারে। নির্বিচারে অ্যান্টিবায়োটিক অপপ্রয়োগের ফলে জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের অন্য নতুন স্ট্রেইনে রূপান্তর করে অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা নিষ্ফল করে দেয়। জীবাণুর এই রেজিস্ট্যান্ট স্ট্রেইন আর কোনো অ্যান্টিবায়োটিকে ধ্বংস না হয়ে বহাল তবিয়তে জীবদেহে অবস্থান ও বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। তখন চিকিৎসক বিকল্প ওষুধ ও চিকিৎসার অভাবে অসহায় হয়ে পড়েন। আমাদের মতো অনুন্নত দেশের মানুষ অতি জটিল সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রেও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া চিকিৎসা শুরু করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে শুধু নিজে গ্রহণ করে না, অন্যকেও অন্যায় ও ভ্রান্তভাবে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে বা পরামর্শ দেয়। এই অপব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্টের আরেক কারণ। তবে সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ওষুধ কম্পানিগুলো। গ্রেফেন স্কুল অব মেডিসিনের জেনারেল ইন্টারন্যাল মেডিসিনের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর স্পেনবার্গ বলেন, আমাদের বুঝতে হবে, অ্যান্টিবায়োটিকের এমন কতগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যান্য ওষুধের প্রযোজ্য নয়। আজ যে অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকারিতা প্রদর্শন করছে, তা পরবর্তী ১০ থেকে ১৫ বছর পর অকার্যকর হয়ে পড়তে পারে। অন্যান্য ওষুধের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না। আর তাই জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে সংক্রামক রোগ মোকাবিলায় নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে পরিস্থিতি এমনভাবে পরিবর্তন হয়ে গেছে যে ওষুধ কম্পানিগুলো নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। আমরা নতুন ওষুধ চাই, নতুন ওষুধ চাই বলে চিৎকার করছি। কিন্তু নতুন ওষুধ আসছে না। ইতিমধ্যে আমরা প্রায় সব অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার উৎপত্তি লক্ষ করছি। কিন্তু সে হারে নতুন অ্যান্টিবায়োটিক বাজারে আসছে না। রেজিস্ট্যান্ট সংক্রামক ব্যাধির সংখ্যা আগামী পাঁচ বছরে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাবে। আমরা যে একদম অ্যান্টিবায়োটিক পাচ্ছি না, তা নয়; কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক বাজারে আসছে। কিন্তু সেসব অ্যান্টিবায়োটিক গ্রাম-নেগেটিভ সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে কার্যকর হচ্ছে না। যেমন সেফটোবাইপ্রোল (Ceftobiprole) এবং সেফ্টারোলিন (Ceftaroline) এরই মধ্যে ট্রায়ালের তৃতীয় ধাপ অতিক্রম করেছে। কিন্তু এ দুটি ওষুধের কার্যকারিতা বা কার্যপ্রণালি সেফেপিমের (Cefepime) মতোই, যা আগে থেকেই বাজারে আছে। কোনো গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া যদি সেফেপিমের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্যান্ট হয়, তাহলে নতুন দুটি ওষুধের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটবে। আমাদের অভাব হলো গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিকের। নতুন অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবনে ওষুধ কম্পানিগুলোর অনীহার কারণ নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার পুঁজি বিনিয়োগ করে একটি অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবন করে বেশি মুনাফা করা যায় না। কম্পানিগুলোর মতে, মানুষ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে অল্প কয়েক দিনের জন্য। ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগের ক্ষেত্রে যেমন রোগীকে আজীবন ওষুধ গ্রহণ করতে হয়, অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে তেমন ঘটে না। দ্বিতীয়ত, একটি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হওয়ার পর যদি অল্প কয়েক বছরে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়, তাহলে ওষুধ কম্পানির পুঁজিও উঠে আসে না, মুনাফা তো পরের কথা। এ ছাড়া উদ্ভাবনের পর কোনো অ্যান্টিবায়োটিকের অ্যাপ্রোভাল পেতে কম্পানিগুলোকে অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোভাল পাওয়াও যায় না। এসব কারণে ওষুধ কম্পানিগুলো অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবনে পুঁজি বিনিয়োগে আজকাল আর আগ্রহ দেখাচ্ছে না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রোগী, জয়ী হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া। এ হলো সত্যিকার অর্থে অশনিসংকেত। তবে ওষুধ কম্পানির মালিকরা কি জানেন, কোনো না কোনো সময় তাঁরাও রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার শিকার হতে পারেন। শিকার হতে পারেন তাঁদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কথা বাদই দিলাম। ওষুধ কম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা আছেন, তাঁরা যদি রেজিস্ট্যান্ট সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিতে চান, তাহলে কোন চিকিৎসক কোন অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে তাঁদের রক্ষায় এগিয়ে আসবেন, তা কি তাঁরা বলতে পারবেন? উত্তর নিয়ে ভাবার অবকাশ রয়েছে। রেজিস্ট্যান্ট সংক্রামক ব্যাধি যদি সারা বিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে মানবসভ্যতা এক মহাবিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। এ বিপর্যয় থেকে কারো রক্ষা নেই। তাই নতুন নতুন কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও ওষুধ কম্পানিগুলোকে সময় থাকতে এগিয়ে আসতেই হবে।

লেখক : অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল ফার্মাসি ও ফার্মাকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
drmuniruddin@yahoo.com